বাইপোলার ডিসঅর্ডার

মুহম্মদ জসীম উদ্দিন

বাইপোলার ডিসঅর্ডার যাকে ম্যানিক ডিপ্রেশন বলা হয়, এটি একটি মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা যা চরম মেজাজের পরিবর্তন ঘটায় যার মধ্যে মানসিক উচ্চতা (ম্যানিয়া বা হাইপোম্যানিয়া) এবং নিম্ন (বিষণ্নতা) অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে চরম আনন্দ বা বিষন্নতা যেকোন একটিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একে ম্যানিক ডিপ্রেসন'ও বলে, যাতে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি জেনেটিক বা জিনগত একটি রোগ।

কখনো কখনো মন অতিরিক্ত প্রফুল্ল থাকা, আবার কখনো কখনো একেবারে বিষণ্ন হয়ে পড়া বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার রোগের লক্ষণ। মানুষ যখন হতাশাগ্রস্ত হয় পড়ে, তখন দু:খিত বা আশাহীন বোধ করে এবং বেশিরভাগ কাজে আগ্রহ বা আনন্দ হারিয়ে ফেলে। যখন মানুষের মেজাজ ম্যানিয়া বা হাইপোম্যানিয়াতে পরিবর্তিত হয় (ম্যানিয়ার চেয়ে কম চরম), তখন সে উচ্ছ্বসিত, শক্তিতে পূর্ণ বা অস্বাভাবিকভাবে খিটখিটে বোধ করতে পারে। এই মেজাজের পরিবর্তনগুলি ঘুম, শক্তি, দৈনন্দিন কাজ , বিচার, আচরণ এবং স্পষ্টভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। মেজাজ পরিবর্তনের বিষয়টি খুব কমই বা বছরে একাধিকবার ঘটতে পারে। যদিও বেশিরভাগ মানুষ কিছু মানসিক উপসর্গ অনুভব করবে, আবার কারো কারো কোনও অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। যদিও বাইপোলার ডিসঅর্ডার একটি আজীবনের সমস্যা, নির্দিষ্ট চিকিৎসা পরিকল্পনা অনুসরণ করে ব্যক্তি মেজাজের পরিবর্তন এবং অন্যান্য লক্ষণগুলি স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বাইপোলার ডিসঅর্ডার ওষুধ এবং মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ (সাইকোথেরাপি) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এরোগ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এর মধ্যে ম্যানিয়া বা হাইপোম্যানিয়া এবং বিষণ্নতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। লক্ষণগুলি মেজাজ এবং আচরণে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যার ফলে ব্যক্তিজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার রোগের সবচেয়ে প্রচলিত কারণগুলোর মধ্যে মস্তিষ্কের আঘাত, শৈশবের অপব্যবহারের ইতিহাস, দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস, স্নায়ুবিক আঘাত এবং পারিবারিক ইতিহাস অন্যতম। ২০-৩৫ বয়সসীমার মধ্যে এ রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এখানে ওষুধের গুরুত্ব খুব বেশি। ওষুধ রোগকে কমাবে এবং প্রতিরোধেও কাজ করবে। ওষুদের মাধ্যমে রোগি দ্রুত উন্নতির দিকে চলে যায়। যারা খুব সৃজনশীল লোক, তাদের মধ্যে বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারের লক্ষণ বেশি। অনেক বড় বড় অভিনেতার মধ্যেও সমস্যাটি রয়েছে। বিষণ্নতা বা ম্যানিয়ার কোনো লক্ষণ থাকলে ডাক্তার বা মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারকে দেখানো উচিৎ। এরোগ নিজে থেকে ভালো হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে এরোগের লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক অভ্র দাস ভৌমিক বলেন, রোগী ভাবে তাকে অনেক কাজ করতে হবে। তার ঘুমানোর দরকার নেই। কথা এত বেশি বলে যে মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে ফেলে। সে বিশাল বড় স্বপ্ন দেখে। তবে বিষণ্নতা রোগে ব্যক্তি কাজে মনোযোগ দিতে পারে না, এখানে দিতে পারে। ব্যক্তি মনে করে তার খাওয়ার দরকার নেই বা ঘুমের দরকার নেই। যেন অনেক শক্তি ও ক্ষমতা এসে ব্যক্তিটির ওপর ভর করেছে। আবার কখনো অবসাদ এত গভীর হয় যে আক্রান্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। কিছু ক্ষেত্রে একটি মিশ্র অবস্থাও দেখা যায়। মেজাজ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং চরম রূপ ধারণ করে, যা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হয়।

বাইপোলার ডিসঅর্ডারের সঠিক কারণ অজানা, তবে জেনেটিক্স, পরিবেশ, মস্তিষ্কের গঠন এবং রসায়ন একটি ভূমিকা পালন করতে পারে। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অভ চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রির এক রিপোর্টে বলা হয়, বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত শতকরা ৬০ ভাগ বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় কৈশোরে বা তার আগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বাইপোলার ডিজঅর্ডার সারা বিশ্বে ষষ্ঠ অক্ষমতার কারণ।

এই রোগ যথেষ্ট জটিল। তাই নির্ণয়ের কাজটিও সহজ নয়। ম্যানিয়াক এপিসোড তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে। সেই কারণে মনোচিকিৎসকেরাও রোগী এবং তাঁর পরিবারের লোকজনকে সতর্ক করে দেন, লক্ষণ প্রকাশ পেলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে। কারণ, ওষুধের তারতম্য আছে। ডিপ্রেশন হলে এক রকম ওষুধ, বাইপোলারের

ক্ষেত্রে অন্য চিকিৎসা। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এক বার দেখেই রোগ চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। চিকিৎসককে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তাঁর পুরনো রোগগুলি সম্পর্কে জানতে হয়। এই রোগীদের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর অনেক বেশি থাকে। সাধারণ অবসাদগ্রস্তদের চেয়ে এঁরা অনেক বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ হন। নেশাসক্ত হওয়ার প্রবণতাও বেশি থাকে।

বাইপোলার ডিসঅর্ডারের চিকিৎসায় মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধ, থেরাপি, জীবন যাপন পদ্ধতি সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিষন্নতা-দূরকারী ও মনোরোগ-দূরকারী ওষুধ দেওয়া হয়। থেরাপি হিসেবে আন্তঃব্যক্তিগত থেরাপি যেখানে প্রাত্যহিক কাজকর্মগুলি যেমন ঘুমানো, খাওয়া প্রভৃতির উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। মনোবিশেষজ্ঞ অভ্র দাস ভৌমিক বলেন, বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারে ম্যানিক এবং বিষণ্ণতা দুটো বিষয়ের একসঙ্গে চিকিৎসা করা হয়। এ ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এ ক্ষেত্রে মুড স্ট্যাবিলাইজার জাতীয় ওষুধ দিতে হয়। মেজাজ স্বাভাবিক রাখার জন্য এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়। বিষণ্ণতা অথবা ম্যানিক পর্যায়, কোনোদিকই যেন রোগীকে পেয়ে না বসে, মনকে মাঝখানে ধরে রাখতে এই ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিষণ্ণতায় আক্রান্ত মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য অ্যান্টিডিপ্রেশন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি ম্যানিক পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ রোগীকে সেবন করতে দেওয়া হয়। অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধগুলো ম্যানিয়া থেকে নামিয়ে বিষণ্ণতার পর্যায়ে নিয়ে আসে। তখন মুড স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করা হয়। মুড স্ট্যাবিলাইজার জাতীয় ওষুধ তিন থেকে পাঁচ বছর খেতে হয়। এ রোগের চিকিৎসা না করলে শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে এছাড়াও এলকোহল বা ড্রাগ ব্যবহার এবং আত্মহত্যাকরার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারের রোগী যখন বিষণ্ণতায় থাকে, সেই ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপির কিছু ভূমিকা রয়েছে। আসলে রোগীর মস্তিষ্কের কিছু ক্যামিক্যালের ভারসাম্যহীনতা হয়। যেখানে ডোপামিন, সেরেটোনিন, অনেক রাসায়নিক পদার্থগুলো ভারসাম্যহীনতা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে কমে যায়। এগুলো সাধারণত কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের শরীর চেষ্টা করে, শরীর চায় এই জিনিসটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। দেখা যাবে দু-একদিনের জন্য আমাদের মনটা বেশি বেশি উৎফুল্ল লাগতেই পারে। কিন্তু এটি যদি চারদিনের বেশি হয়, তখন একে অস্বাভাবিকতা হিসেবে ধরা হয়।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার একপ্রকার মানসিক রোগ। এটি ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘমেয়াদী রোগ। যেকোনও মানুষই এরোগে আক্রান্ত হতে পারেন। এতে লজ্জা বা ভয়ের কিছু নেই। নিজে বা কাছের কেউ বাইপোলার ডিসর্ডারের শিকার বুঝতে পারলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ওষুধ এবং চিকিৎসার মাধ্যমে রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তবে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা যায় না।

#

পিআইডি ফিচার